OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 352 - 363
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 352 - 363
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

ধার্মিক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : প্রেক্ষাপট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

ড. রুবেল পাল
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
শ্রী রামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যামহাপীঠ কামারপুকুর, হুগলি
Email ID: rubelpalsans513@gmail.com

Received Date *11. 12. 2023*
Selection Date *12. 01. 2024*

Keyword
Swami Vivekananda, Vidyasagar, Sri Ramakrishna, Dharma, Philosophy, Caste, Varna, Vedanta.

Abstract
Iswar Chandra Vidyasagar, one of the Avant garde representatives of the Renaissance in Bengal was a devout Hindu Brahmin in orientation. He wears the sacred thread of the Brahmin and performed traditional rituals and customs with seriousness and dedication. He believed in God, but didn't believe in resignation to destiny. He was a scholar empowered with self esteem and a consciousness of the self. The polemical criticism concerning Vidyasagar involves his faith in God.

According to the popular consensus, the person, who believes in God is a theist. In that sense, the life of Vidyasagar does not testify atheist inclination. On the contrary, he categorically acknowledged that he does not have the scope to delve in the ocean of faith to fathom the abode of divinity

Unlike many intellectuals of the nineteenth century, he practiced what he preached throughout his life. As the principal of Sanskrit College, he lifted the restriction that no one, other than Hindu and Buddhist would be allowed to study over there. He opened the gate of Sanskrit College to everyone and contributed to the expansion of education in Bengal in the nineteenth century

This paper intends to explore and address the polemic issue about the atheism of Vidyasagar. It endeavours to render Vidyasagar as a man of wisdom, who often conceive faith as the panacea and the Hindu scriptures as the infinite source of knowledge, inexhaustible.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 352 - 363
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে খুব সুন্দর বলছেন- Religion is the manifestation of divinity, already in man. অর্থাৎ ধর্ম হল মানুষের মধ্যে বিদ্যমান দেবত্বের বিকাশ। ধৃ-ধাতুর মনিন্-প্রত্যয়ে ধর্ম শব্দের ব্যুৎপত্তি করলে অর্থ হয় যা আমাদের ধারণ করে তাই ধর্ম। আর এই ধর্ম শব্দের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করলে, আমৃত্যু মানবজীবনের যে যাত্রাপথ সেই যাত্রাপথে মানুষ কায়িক ও মানসিকভাবে নিরন্তর যেসকল সদাচারের মধ্য দিয়ে জীবন ধারণ করে পরিণামে আত্মবিকাশের পথে অগ্রসর হয় তাহাই হল মানুষের মূল ধর্ম। হিন্দু ধর্ম বা সনাতন ধর্ম আবৈদিক কাল থেকে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে সব সময় সেই এক রহস্যময় নিত্য শাশ্বত সত্যস্বরূপ অস্তিত্বের অন্বেষণ করে গেছে। আর সেই সত্যের অনুসন্ধান করতে গিয়ে 'নানা মুনির নানা পথ' এই রকমই বিবিধ পন্থায় বিভক্ত হয়েছে সেই সকল সনাতনী সত্যানুসন্ধানকারীরা। এদের মধ্যে কেউ কেউ প্রকৃতির জল, বায়ু, আকাশ, সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদিকেই নিজের আরাধ্য রূপে ভজনা করেছে। কেউ কেউ আবার এদেরই মূর্তি তৈরি করে অথবা এদের নানান প্রতীককে মূর্তি রূপে ভজনা করেছে। অনেকে শুধু মেতেছে আচার অনুষ্ঠান অথবা বিবিধ সংস্কার নিয়ে। পরবর্তীকালে এই সকল সংস্কার থেকেই হিন্দু ধর্মের অঙ্গ হয়েছে হয়েছে বর্ণপ্রথা, চতুরাশ্রম, খাদ্যবিধি, পোশাক-পরিচ্ছদ, পূজা-অর্চনা ঈশ্বর-নিরীশ্বরবাদ, আস্তিক্য-নাস্তিক্যবাদ, ভাববাদ বস্তুবাদ, জড়বাদ, মানবতাবাদ ইত্যাদি আরো অনেক কিছু। তবে যাই হোক, এই সমস্ত পথের মধ্য দিয়েই এরা সব সময় খুঁজে বেড়িয়েছে একটা নির্দিষ্ট সত্যকে, যে সত্য সর্বদা এদের জীবন চর্চাকে সুন্দর হতে সুন্দরতম করতে সহায়ক হয়েছে। আর সত্যান্বেষণের মধ্যে যখনই কোন ভুলভ্রান্তি হয়েছে তখনই কিছু নির্বোধ শুধুমাত্র মত্ত হয়েছে তাদের সমালোচনায়, ব্যস্ত থেকেছে এদেরকে সনাতনী হিন্দু থেকে অন্য কিছু রূপে চিহ্নিত করার কাজে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এরা আসলে এরা কেউই হিন্দু ভিন্ন অন্য কিছু নয়, কিন্তু এদের সাধনা বা জীবন চলার পদ্ধতি আলাদা। তাই ঋষির দৃপ্ত কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়েছে– 'একম্ সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি। অর্থাৎ সেই সত্যই কথিত হয়েছে নানান রূপে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাই সুন্দর বলেছেন– 'যত মত তত পথ।' এই রকমই এক ভিন্ন পথের পথিক ছিলেন পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, যার প্রকৃত নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই নাম শুনলেই আমরা বুঝতে পারি তিনি ছিলেন একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ। আর তাই তিনি হিন্দুদের লৌকিক রীতিনীতি মেনে ওই পইতে ধারণ করতেন এবং শ্রাদ্ধাদি বিভিন্ন সংস্কারও পালন করতেন। কিন্তু তিনি কখনও কোন গোঁড়ামিতে বা আড়ম্বরতায় বিশ্বাস করতেন না। তিনি অবশ্যই সরল ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন, কিন্তু কোন কাজ না করলে ঈশ্বর সমস্ত কিছু করে দেয় এইরকম ভাবনায় বিশ্বাস করতেন না। তিনি ছিলেন অন্তর্নিহিত আত্মশক্তিতে বলীয়ান একজন সুপুরুষ পন্ডিত। আর এই আত্মা বা ব্রহ্মকে বিশ্বাস করতেন বলেই তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন। কিন্তু তিনি পরলোক বা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করতেন না। আবার তিনি কখনোই মূর্তি পূজা করতেন না বা মূর্তি পূজায় বিশ্বাস করতেন না। আমরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ঠাকুরের সাথে তাঁর সাক্ষাৎকার কালে দেখতে পাই তিনি, হিন্দু ধর্মের কিছু রীতিনীতি বিষয়ে বিরোধিতা করেছেন। মাস্টারমশাইয়ের ঈশ্বর সম্পর্কীয় জিজ্ঞাসায় তিনি একটু অন্য রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন, কয়েকবার আবার ঠাকুর রামকৃষ্ণ তার কাছে ঈশ্বর সম্বন্ধে মতামত জানতে চাইলে তিনি সেই প্রসঙ্গ সুকৌশলে এড়িয়েও গেছেন। সর্বোপরি তিনি তাঁর জীবনব্যাপী নিষ্কাম কর্মের মধ্য দিয়ে মানবতার পূজা করে গেছেন। আর বিদ্যাসাগরের এইসকল আচরণ লক্ষ্য করেই আমরা অনেকে তাকে অহিন্দু অধার্মিক অথবা নাস্তিক অথবা জড়বাদী বা বস্তুবাদী বলে থাকি। কিন্তু বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে এই ধারণা যে সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত বা অন্ধের হস্তী দর্শনের মত অর্ধসত্য তা আমরা পরবর্তী আলোচনার মধ্য দিয়ে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ধর্মীয় বোধ ও চেতনার উন্মেষ ঘটে তার মা ভগবতীদেবীর ধর্মদর্শন থেকে। ভগবতী দেবীর ধর্ম বিশ্বাস ছিল অত্যন্ত সরল এবং অনাড়ম্বর। তিনি কখনোই লোক দেখিয়ে নিজের ধর্মমতকে জাহির করতেন না। মায়ের মত বিদ্যাসাগরের ও ধর্ম সম্পর্কে ধারণা ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সহজ-করতেন ভগবতী দেবী কখনোই মূর্তি পূজা করতেন না। তার বিশ্বাস ছিল যে মূর্তি মানুষ তৈরি করে, সেই মানুষের তৈরি মূর্তি আবার মানুষকে কিভাবে রক্ষা করবে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 352 - 363
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রকৃতপক্ষে ভগবতী দেবী মানুষকেই দেবতা বলে মনে করতেন এবং সেই মানব দেবতারই পূজা করতে পছন্দ করতেন। আর এই ভাবনাতেই বিশ্বাসী ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আর সেই কারণেই বিদ্যাসাগর তার সমগ্র জীবনব্যাপী মানুষের সেবা করে গেছেন, মানুষের প্রতি অগাধ দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করেছেন, আর হয়ে উঠেছেন আপামোর সাধারণের দয়ারসাগর। তাই একবার কথামৃত করার মাস্টারমশাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর কাছে তার ঈশ্বর সম্পর্কীয় কি মতামত তা জানতে চাইলে বিদ্যাসাগর উত্তর দেন –

> "তাঁকে তো জানবার জো নাই! এখন কর্তব্য কি? আমার মতে কর্তব্য আমাদের নিজেদের এরূপ হওয়া উচিত যে, সকলে যদি সেরূপ হয়, পৃথিবী স্বর্গ হয়ে পড়বে। প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত যাতে জগতের মঙ্গল হয়।"[১]

বস্তুতপক্ষে বিদ্যাসাগরের এই মতামত থেকেই আমরা বুঝতে পারি তিনি মানব দেবতার পূজারপূজারী ছিলেন। প্রত্যেক মানুষ যদি পরস্পরের মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারে তবেই এই জগত থেকে সমস্ত হিংসা তথা কলুষতা একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাই উপনিষদে ঋষির কণ্ঠে আম্নাত হয়েছে –

"যস্ত সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।"[২]

অর্থাৎ যিনি সমস্ত ভূতকে নিজের মধ্যে এবং সর্বভূতের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করেন তিনি কখনোই কাউকে হিংসা করেন না বরং সকলের কল্যাণ চান। এটাই ছিল বিদ্যাসাগর এর ধর্ম বিশ্বাসের মূল্য ভিত্তি।

তবে বিদ্যাসাগর কখনোই কারো ধর্মকে আঘাত করতেন না। তিনি যে নিজেও হিন্দু ধর্মের রীতি রেওয়াজ পালন করতেন না তাও নয়। বরং নিজে শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান করতেন এবং ব্রাহ্মণের যে উপবীত তাও সগর্বে ধারণ করতেন। আমরা যদি বিদ্যাসাগরের লেখা চিঠি পত্রের দিকে লক্ষ্য রাখি, তাহলে দেখব তিনি পত্রের প্রারম্ভে লিখতেন- 'শ্রীশ্রী হরি শরণম্'। এখান থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি তিনি পৌরাণিক যেসকল দেবতা হরি, বিষ্ণু, শিব তাদেরকেও শ্রদ্ধা করতেন। তবে তিনি ধর্মের যে মূল সার তা উপলব্ধি করেছিলেন। আমরা যে প্রত্যেকেই সেই একই ব্রহ্মের বা পরমাত্মার এবং সেই কারণে আমরা পরস্পরের পরম আত্মীয়, বিদ্যাসাগর তার সমগ্র জীবনব্যাপী কর্মের মধ্যে দিয়ে সেটাই আমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। তাই কথামৃত কার মাস্টারমশাই খুব সুন্দর লিখেছেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত গ্রন্থে –

> "ধর্ম বিষয়ে বিদ্যাসাগর কাহাকেও শিক্ষা দিতেন না। তিনি দর্শনাদি গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন। মাস্টার একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন– 'আপনার হিন্দুদর্শন কিরূপ লাগে? 'তিনি বলিয়াছিলেন – 'আমার তো বোধ হয়, ওরা যা বুঝতে গেছে, বুঝাতে পারে নাই'। 'হিন্দুদের ন্যায় শ্রাদ্ধাদি ধর্ম-কর্ম সমস্ত করিতেন, গলায় উপবীত ধারণকরিতেন, বাংলায় যে সকল পত্র লিখিতেন, তাহাতে 'শ্রী শ্রীহরিশরণম', 'ভগবানের এই বর্ণনা আগে করিতেন।"[৩]

এখন যে বিষয়ে মূলতঃ সংশয় তা হল বিদ্যাসাগর আস্তিক নাকি নাস্তিক ছিলেন। এই প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে আমরা এই আস্তিক বা নাস্তিক বলতে সাধারণত কি বুঝে থাকি। আস্তিক বা নাস্তিক বিষয়ে বহুল প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন তিনিই আস্তিক, আর যিনি করেন না তিনি নাস্তিক। সেই অর্থে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে ঈশ্বরে অবিশ্বাস করতেন তা কোন মতেই তার জজীবন অধ্যয়ন করলে প্রমাণিত হয় না। বরং তিনি এটাই মানতেন যে, ঈশ্বর আছে কিন্তু তাকে জানবার জন্য যে ভক্তি বা সাধনার প্রয়োজন আছে, সেই বিষয়ে মনোনিবেশ করার ইচ্ছা বা শক্তি কোনটিই তার নেই। তাই মাস্টারমশাই ঈশ্বর সম্পর্কে তার কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন – "তাঁকে তো জানবার জো নাই।..."[৪]

মাস্টারমশাই বিদ্যাসাগরের ঈশ্বর ভাবনা বিষয়ে বলেন –

> "বিদ্যাসাগর মহাপন্ডিত। ষড়দর্শন পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন, বুঝি ঈশ্বরের বিষয় কিছুই জানা যায় না।"[৫]

ভারতীয় দর্শন ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, পূর্ব-মীমাংসা ও বেদান্ত এই 6 টি আস্তিক এবং বৌদ্ধ, জৈন ও চার্বাক এই তিনটি নাস্তিক ভেদে বিভক্ত। এ সমস্ত দর্শনে ঈশ্বর সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করা হয়েছে। আর এই

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 352 - 363
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মতের বিভিন্ন তা দেখেই বিদ্যাসাগর ঈশ্বর সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়েছেন এবং হয়তো ভেবেছেন তাঁকে জানা যায় না। তাই মধ্যে মধ্যে তিনি ঈশ্বর সম্পর্কে সংশয়ও প্রকাশ করেছেন। আমরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত গ্রন্থে দেখতে পাই বিদ্যাসাগর বলেছেন-

> "ঈশ্বরকে ডাকবার আর কি দরকার! দেখ, চেঙ্গিস খাঁ যখন লুটপাট আরম্ভ করলে তখন অনেক লোককে বন্দী করলে, ক্রমে প্রায় এক লক্ষ বন্দী জমে গেল। তখন সেনাপতিরা এসে বললে, মহাশয় - এদের খাওয়াবে কে? সঙ্গে এদের রাখলে বিপদ, ছেড়ে দিলেও বিপদ, কি করা যায়? তখন চেঙ্গিস খাঁ বললেন, কি করা যায়, এদের সব বধ কর। তাই কচাকচ করে কাটার হুকুম হয়ে গেল। এই হত্যাকাণ্ড তো ঈশ্বর দেখলেন, কই একটু নিবারণ তো করলেন না। তা তিনি থাকেন থাকুন আমার দরকার হচ্ছে না। আমার তো কোন উপকার হল না।"[৬]

উপরের মন্তব্য থেকেও এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে ঈশ্বর সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের ধারণা খুব একটা স্পষ্ট নয়, বরং তিনি এ বিষয়ে অনেকটা সন্দিহান এবং উদাসীন। তবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই, ঠাকুর রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরকে বারংবার ঈশ্বর বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বিদ্যাসাগরের ধারণা ঈশ্বর যদি সমস্ত কিছুর কর্তা হন তবে সমাজে এত খারাপ কাজ কেন হয়ে থাকে। ঈশ্বর কেন সমাজের মন্দ কারবারকে সব সময় রুখে দিতে পারেন না? বিদ্যাসাগরের ঈশ্বর সম্পর্কীয় এই সংশয়ের তাৎপর্য বুঝতে পেরে ঠাকুর তাকে বিভিন্ন উপদেশ দিতে থাকেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর কে বোঝানোর চেষ্টা করেন এই জগতে বিদ্যামায়া এবং অবিদ্যামায়া দুটোই আছে, ভালো এবং মন্দ আছে, কিন্তু এগুলি সব জীবের পক্ষে। এতে পরমেশ্বর বা ব্রহ্মের কোন বিকৃতি হয় না অর্থাৎ কিছু যায় আসে না। ঠাকুর রামকৃষ্ণ সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন-

> "এ জগতে বিদ্যামায়া অবিদ্যামায়া দুই-ই আছে; জ্ঞান-ভক্তি আছে, আবার কামিনী-কাঞ্চনও আছে, সৎও আছে অসৎও আছে। ভালোও আছে আবার মন্দও আছে। কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। ভালো-মন্দ জীবের পক্ষে, সৎ-অসৎ জীবের পক্ষে, তার ওতে কিছু হয় না। যেমন প্রদীপের সম্মুখে কেউবা ভাগবত পড়ছে, আর কেউবা জাল করছে। প্রদীপ নির্লিপ্ত। সূর্য শিষ্টের উপর আলো দিচ্ছে, আবার দুষ্টের উপরও দিচ্ছে। যদি বল দুঃখ, পাপ, অশান্তি - এ-সকল তবে কি? তার উত্তর এই যে, ও-সব জীবের পক্ষে। ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। সাপের ভিতর বিষ আছে, অন্যকে কামড়ালে মরে যায়। সাপের কিন্তু কিছু হয় না।"[৭]

এই ভাবে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরকে খুব সুন্দরভাবে ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝিয়েছেন। বিদ্যাসাগর একাগ্রচিত্তে ঠাকুরের এইসকল ঈশ্বর সম্পর্কে উপদেশ যে শুধু কেবল শুনেই গেছেন তা নয়, মধ্যে মধ্যে তা আত্মস্থও করেছেন। তাই ঠাকুর যখন ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন –

> "ব্রহ্ম যে কি, মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়দর্শন - সব এঁটো হয়ে গেছে! মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে- তাই এঁটো হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সে জিনিসটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি আজ পর্যন্ত কেউ মুখে বলতে পারে নাই।"[৮]

তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেছেন – "বা! এটি তো বেশ কথা! আজ একটি নতুন বাসা শিখলাম।"[৯] অর্থাৎ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বর বা ব্রহ্মের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা বিদ্যাসাগরের মনে দাগ কেটে গিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগর বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বরের স্বরূপ বোঝা খুব একটা সোজা নয়। তাই তিনি সে বিষয়ে বিশেষ ভক্তি বা আগ্রহ কখনোই দেখাননি।

বস্তুতপক্ষে ব্রহ্মকে জানা অত্যন্ত দুরূহ। নিরন্তর সাধনা, নিষ্কাম কর্মও অহংকারশূন্য নিস্কলুষ জ্ঞানের মধ্যদিয়েই একমাত্র ব্রহ্মকে জানা সম্ভব। কিন্তু যে ব্যক্তি মনে করেন অল্প একটু পড়াশুনা করেই আমি ব্রহ্মকে জেনে ফেলেছি, তিনি প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারেননি। তাই কেনোপনিষদে খুব সুন্দর বলা হয়েছে, - "যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্...।"[১০]

আর তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরকে বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে বলেছেন –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 352 - 363
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> “মানুষ মনে করে, আমরা তাকে জেনে ফেলেছি। একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে গিছিল। একদানা খেয়ে পেট ভরে গেল, আর এক দানা মুখে করে বাসায় যেতে লাগল, যাওয়ার সময় ভাবছে - এবার এসে সব পাহাড়টি লয়ে যাব। ক্ষুদ্র জীবেরা এইসব মনে করে। জানেনা ব্রম্য বাক্যমনের অতীত। যে যতই বড় হউক না কেন, কাকে কি জানবে?”[১১]

তাই কেনোপনিষদে বলা হয়েছে– “ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি নো বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ...।”[১২] ঠাকুর রামকৃষ্ণ আরও বলেন, নুনের পুতুল যদি সমুদ্র মারতে যায় তবে সে কি আর সেই সমুদ্রের খবর দিতে পারবে, বরং সে তো সমুদ্রে অর্থাৎ নিজ স্বরূপে বিলীন হয়ে যাবে। সেই রকম ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে সাধারণ জীবের পক্ষে জানা একেবারেই সম্ভব নয়। শুধুমাত্র সমাধিস্থ দশায় তাকে জানা যায় বা অনুভব করা যায়। ঠাকুর তাই বলেছেন –

> “সমাধিস্সমাধিস্থ হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়; ব্রহ্মদর্শন হয় - সেই অবস্থায় বিচার একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, মানুষ চুপ হয়ে যায়।”[১৩]

আর বিদ্যাসাগর মহাশয় যেহেতু প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞানী ছিলেন, তাই তিনি ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ বুঝেছিলেন বলেই সে বিষয়ে কখনো বিশেষ কোন মন্তব্য করেননি। উপনিষদের ঋষি দের মত অথবা পরমহংস ভগবান শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের মত ঈশ্বর সম্পর্কে জিজ্ঞাসায় তিনি শুধু বলেছেন, - “তাকে তো জানবার জো নাই!”[১৪]

হিন্দুধর্ম তথা ঈশ্বর সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর যথার্থ বুঝেছিলেন বলেই বোধ করি তিনি কখনো কাউকে এ বিষয়ে কোনো শিক্ষা দিতেন না। কেউ তার কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি চুপ করে থাকতেন। এই প্রসঙ্গে ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব তার কাছে অনেকবার মতামত জানতে চাইলে তিনি সুকৌশলে সেই প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন। তাই ঠাকুর ঈশ্বর বা ব্রহ্ম সম্পর্কে নানান উপদেশ দেওয়ার পর একবার বিদ্যাসাগরের কাছে সেই প্রসঙ্গে তার মতামত জানতে চেয়ে বলেন –

> “তাঁকে কি বিচার করে জানা যায়? তার দাস হয়ে, তার শরণাগত হয়ে তাকে ডাক। (বিদ্যাসাগরের প্রতি সহাস্যে) - আচ্ছা তোমার কি ভাব ?”[১৫]

বিদ্যাসাগর তখন ঠাকুরের সেই প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বলেন যে – “আচ্ছা সে-কথা আপনাকে একদিন একলা-একলা বলব।”[১৬] ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগরের এই সকল কথোপকথন থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে বিদ্যাসাগর ঈশ্বর সম্পর্কে বা ব্রহ্মের স্বরূপ সম্পর্কে যথার্থই বুঝেছিলেন। কিন্তু সে বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞানীর মত তিনি কোন মতামত ব্যক্ত করতে চাইতেন না। আর তার কারণ কি তা বুঝতে গেলে পুরাণের একটি গল্প থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারব। একজন পিতার দুজন পুত্র ছিল। তিনি তার দুই পুত্রকে গুরুগৃহে বিদ্যালয়ের জন্য পাঠিয়েছিলেন। বিদ্যা লাভের পর যখন সে তার দুই পুত্র তার কাছে ফিরে আসে, পিতা প্রথমে জ্যেষ্ঠ পুত্রের কাছে ব্রহ্মা ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে জানতে চায়। বড় ছেলে তখন বেদ ও উপনিষদ থেকে নানা মন্তব্য উদ্ধৃতি করে পিতাকে ব্রহ্মের স্বরূপ বোঝাতে থাকেন। কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্রের কাছে জানতে চাইলে, সে তখন চুপ করে থাকে। পিতা তখন বুঝতে পারেন যে তাঁর কনিষ্ঠপুত্র এই প্রকৃত অর্থে ব্রহ্মের স্বরূপ কে উপলব্ধি করতে পেরেছে। বিদ্যাসাগরও পুরাণের সেই বর্ণিত কনিষ্ঠ পুত্রের ন্যায় ঈশ্বরের বা ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন। আর সেই কথা ঠাকুর নিজে মুখে স্বীকারও করেছেন যে, বিদ্যাসাগর প্রকৃত অর্থে ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষ। তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণ চমৎকার উদাহরণ সহযোগে উদ্-ঘোষিত করেছেন-

> “(ঠাকুর বিদ্যাসাগরের প্রতি সহস্যে) এ-যা বললুম, বলাবাহুল্য আপনি সব জানেন- তবে খপর নাই। (সকলের হাস্য) - বরুণের ভান্ডারে কত কি রত্ন আছে! বরুণ রাজার খপর নাই!”[১৭]

ঠাকুরের এই মন্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, বিদ্যাসাগরের ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা খুবই স্পষ্ট ছিল। তবে সেই বিষয়ে তিনি যথেষ্ট উদাসীন। কিন্তু ঠাকুর যখন বিদ্যাসাগরকে ঈশ্বর বিষয়ে নানান উপদেশ দিচ্ছেন এবং সেই ঈশ্বরীয় জ্ঞান সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর যে নিজেও অবহিত আছেন তা স্বীকার করেছেন, ঠাকুরের সেই অকপট তথা অমোঘ স্বীকারোক্তিকে বিদ্যাসাগর নিজেও সম্মতি জানিয়েছেন। তাই বিদ্যাসাগর ঠাকুরের প্রশংসাকে সম্মতি জানিয়ে বলেন – “তা আপনি বলতে পারেন।”[১৮]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 352 - 363
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উপরের সম্মতি থেকে এটা স্পষ্ট যে বিদ্যাসাগর ধর্ম মানতেন এবং ঈশ্বরও মানতেন। কিন্তু ধর্মীয় কোন কুসংস্কার বা আ আড়ম্বরতায় বা গোঁড়ামিকে তিনি কোনোভাবেই বরদাস্ত করতেন না। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষ 'যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে খুব স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন –

> "মূর্তি গড়ে দেবদেবীর পূজোর কথা উঠলে ভগবতী দেবী নাকি বলতেন, যে দেবতা আমি নিজের হাতে গড়লাম, সে আমাকে উদ্ধার করবে কেমন করে? বাঁশ, খড়, দড়ি, মাটি দিয়ে ঠাকুর গড়ে পুজো করে কি ধর্ম হয়? এই কথা থেকে বোঝা যায়, ভগবতী দেবীর ধর্ম বিশ্বাস, ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান ও ধারণা কত সহজ, সরল ও স্বাভাবিক ছিল। ধর্ম সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরেরও ঠিক তার মায়ের মত পরিষ্কার ধারণা ছিল। তার মধ্যে কোন বাহ্য আড়ম্বর ছিল না। কখনও তিনি লোক দেখিয়ে নিজের ধর্মমত জাহির করতে চাননি। ধর্মের আড়ম্বর অনুষ্ঠানে তিনি একেবারেই বিশ্বাস করতেন না। অথচ ধর্ম মানতেন, ঈশ্বরও মানতেন।"[১৯]

এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের জীবনী লেখক চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে লিখেছেন –

> "তাহার আচার আচরণ হইতে যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে এরূপ বোধ হয় যে, তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসী লোক ছিলেন। তবে তাহার ধর্মবিশ্বাস সাধারণ লোকের অনুষ্ঠিত কোন এক পদ্ধতির অধীন ছিল না। সূক্ষ্মতর রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে গেলে তাহার নিত্য জীবনের আচার-ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন আস্থাবান হিন্দুর অনুরূপ ছিল না। অপরদিকে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের লক্ষণের পরিচয় ও কখনও পাওয়া যায় না।"[২০]

এই সমস্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট ভাবে বোঝা গেল যে বিদ্যাসাগর ঈশ্বর মানতেন, কিন্তু ঈশ্বর বিষয়ে তার অনুভব ছিল সাধারণ মানুষের থেকে একটু আলাদা। যদিও তিনি পৈতে ধারণ করা বা শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনুষ্ঠান পালনের মত কিছু সংস্কার মেনে চলতেন, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাঁর ঈশ্বরীয় অনুভব শুধুমাত্র কিছু সংস্কার বা লুকাচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাই ১৮৮১ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি বক্তৃতায় যখন'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। এই মন্তব্যটি করেছিলেন, তখন বিদ্যাসাগরও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই মন্তব্যটি গ্রহণ করে বলেছিলেন –

> "ঈশ্বর কি প্রাণী, কি উদ্ভিদ, কি জড় সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন, এ নিমিত্ত ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা বলা চলে। ঈশ্বরকে কেউ দেখিতে পায় না, কিন্তু তিনি সর্বত্র বিদ্যমান আছেন। আমরা যাহা করি তিনি তাহা দেখিতে পান। আমরা যাহা মনে মনে ভাবি তাহাও তিনি জানিতে পারেন। ঈশ্বর পরম দয়ালু, তিনি সমস্ত জীবেরা আহার দাতা ও রক্ষাকর্তা।"[২১]

অর্থাৎ বিদ্যাসাগর যে ঈশ্বরকে মানিতেন সেই ঈশ্বরের স্বরূপ হল সদামঙ্গলময়। তাঁর ঈশ্বর মানবতার ঈশ্বর, তাঁর ঈশ্বর সমাজ সংস্কারের ঈশ্বর, তাঁর ঈশ্বর সুস্থ ও স্বাভাবিক সমাজের রক্ষা ও পুনর্গঠনের ঈশ্বর। তাই মাস্টারমশাই শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত একবার যখন বিদ্যাসাগরের কাছে ঈশ্বর সম্পর্কে মতামত জানতে চেয়ে শোনেন, -

> "মাস্টার আরেকদিন তাহার মুখে শুনিয়াছিলেন, তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে কিরূপ ভাবেন। বিদ্যাসাগর বলিয়াছিলেন, তাকে তো জানবার জো নাই! এখন কর্তব্য কি? আমার মতে কর্তব্য, আমাদের নিজের এরূপ হওয়া উচিত যে, সকলে যদি সেরুপ হয়, পৃথিবী স্বর্গ হয়ে পড়বে। প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত যাতে জগতের মঙ্গল হয়।"[২২]

অর্থাৎ বিদ্যাসাগর যে নীতি মানতেন তাহা হল 'আপনি আচরি ধর্ম শেখাও অপরে'। তার মতে শুধু ধর্মীয় বিশ্বাস আর ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্যহীন অন্ধ ভক্তি থাকলেই কখনোই নিজের মুক্তি তথা জগতের কল্যাণ সম্ভব নয়।

এখন আমরা আলোচনা করব সে বিষয়ে, যে কারণে সাধারণত অনেক সমালোচক বিদ্যাসাগরকে অধার্মিক বা নাস্তিক বলে থাকেন। আমরা যদি বিদ্যাসাগরের সমগ্র জীবনকে সুন্দরভাবে অনুধাবন করি তাহলে দেখতে পাব, তিনি জীবনের কোন কালাংশেও সাক্ষাৎ শারীরিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কোন দেব-দেবীর আরাধনা করেননি বা মূর্তি পূজা করেননি। বিদ্যাসাগরের ভাই শম্ভুচন্দ্র তার লেখায় এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, ছোটবেলা থেকেই বিদ্যাসাগরের কাল্পনিক

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 352 - 363
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল না। মূলত হিন্দুরা দেব-দেবীর উপাসনা করে থাকে, কিন্তু বিদ্যাসাগর হিন্দুদের রীতিনীতি মানতেন না। এখন কেউ কেউ বিদ্যাসাগর মূর্তি পূজা করতেন না বা হিন্দু দেবদেবীর প্রতি আস্থা রাখতেন না বলে তাকে অহিন্দু বা অধার্মিক বা নাস্তিক বলে থাকেন। এখন এই বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে আগে বুঝে নিতে হবে হিন্দুধর্মের ব্যাপকতা কতদূর। আমরা বেদে এবং তৎপরবর্তী পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থে বিভিন্ন দেবদেবীর উল্লেখ পাই। তবে সেখানে কোথাও এরকম বর্ণনার নেই যে, যারা সনাতন হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী তারা প্রত্যেকেই শুধুমাত্র দেবদেবীর আরাধনা বা পূজা অর্চনা করে। বরং সেখানে আমরা দেখতে পাই যে, প্রাচীন মুনি ঋষিদের একাংশ প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সেই পরমেশ্বরের সত্তাকে উপলব্ধি করে কখনও তাকে অগ্নিরূপে, কখনও বা ইন্দ্ররূপে, কখনও বা রুদ্ররূপে, কখনও আবার বাগ্-দেবীরূপে, কখনও বা পুরুষ ইত্যাদি নানান রূপে ভজনা করেছেন। এই ভাবে তারা সাকার মূর্তমানরূপের আরাধনার মধ্য দিয়ে নিরাকার অমূর্ত সেই এক ও অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন। আবার কখনো কখনো মনীষীরা সাক্ষাৎ সচ্চদানন্দস্বরূপ এক ও অদ্বিতীয় নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করেছেন। এই ভাবে পরবর্তীকালে কেউ হয়ে উঠেছেন সেই সকল বৈদিক অগ্নি, ইন্দ্র, রুদ্র প্রভৃতি দেব দেবীর উপাসক, কেউ বা হয়ে উঠেছেন পৌরাণিক শিব, কালী, দুর্গা, বিষ্ণু বা ব্রহ্মার উপাসক। আবার কেউ কেউ হজনা করে চলেছেন মর্যাদা পুরুষোত্তম রাম অথবা কৃষ্ণ বা কলির রামকৃষ্ণ প্রকৃতি অবতারের উপাসক। তবে সেই যাই হোক হোক, হিন্দু সংস্কৃতির অঙ্গস্বরূপ এই সকল সাধন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে এরা প্রত্যেকেই সেই এক অদ্বিতীয় সত্তাকেই খুঁজে পেতে চেয়েছেন বা উপলব্ধিও করেছেন এবং পরিণামে জগতের কল্যাণ সাধন করেছেন। এটাই হল হিন্দু ধর্মের মূল উদ্দেশ্য।

এখন আসা যাক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথায়। হ্যাঁ বিদ্যাসাগর সত্যিই সাক্ষাৎ মূর্তি পূজা করতেন না বা মূর্তি পূজা পছন্দও করতেন না, কিন্তু তিনি যে মানসিক ভাবে কোন দেবতার স্মরণ নিতেন না একথা একেবারেই ভ্রান্ত। আমরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের এক জায়গায় উল্লেখ পাই যে বিদ্যাসাগর কাউকে পত্র লেখার শুরুতে শ্রীহরির স্মরণ নিতেন। মাস্টারমশাই তাই লিখেছেন,

"বাংলায় যে পত্র লিখিতেন, তাহাতে শ্রীহরিশরণং এই বর্ণনা আগে করিতেন।"[২৩]

মনে রাখতে হবে বিদ্যাসাগর যে মূর্তি পূজা করতেননা বা দেব দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখাতে না, তা একেবারেই বলা যায় না। বিদ্যাসাগর তার পিতা-মাতাকে অগাধ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতেন। পিতার কষ্ট দেখে বিদ্যাসাগর তার পিতাকে কলকাতার কাছ থেকে ছাড়িয়ে দিয়ে গ্রামের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এবং নিজে অনেক কষ্টে কিছু অর্থ উপার্জন করে সেই টাকায় বাড়িভাড়া ও তার সমস্ত ভাইদের খরচ প্রভৃতি বহন করে, সেখান থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন, যাতে পিতাকে আর শারীরিক কষ্ট করতে না হয়। এই ঘটনা বিনয় ঘোষ তার 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' এই গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। মায়ের প্রতি বিদ্যাসাগরের এমনই শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল যে, ঘোর বর্ষাকালে শুধুমাত্র মায়ের আদেশ পালনের জন্য ভরা দামোদর নদী সাঁতরে পার করে বীরসিংহ গ্রামে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে, - 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেব ভব...'[২৪] অর্থাৎ অন্যান্য দেবদেবীর মতো হিন্দু শাস্ত্র ও সংস্কৃতি অনুযায়ী এটা এবং মাতাও পরস্পর দেব ও দেবী। আর বিদ্যাসাগর তার এই পিতৃরূপী ও মাতৃরূপী দেবদেবীর প্রতি এতটাই শ্রদ্ধাবান ছিলেন যে, একবার বিদেশ থেকে আগত একজন খ্যাতনামা চিত্রশিল্পীকে দিয়ে তার পিতামাতার অনেকগুলি পোর্ট্রেট ছবি আঁকিয়েছিলেন। শুধু আঁকিয়েছিলেন এই নয়, তার কর্মজীবন কারমাটরে যে ঘরে তিনি থাকতেন, সেই ঘরে তার পিতামাতার দুইখানি প্রতিকৃতি সর্বদা রেখে দিতেন এবং প্রতিদিন কাজে বেরোনোর আগে সেই প্রতিকৃতি দুইখান তে প্রণাম করে বের হতেন। আর দুইখানি ছবি যেখানে যেখানে যেতেন সেখানে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন।[২৫] এখান থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে প্রতিকৃতি বা মূর্তির মধ্যে যে চিন্ময়ী সত্তার উপলব্ধি আছে তা বিদ্যাসাগর বিশ্বাস করতেন। শুধু তফাৎ এই যে তিনি বৈদিক ও পৌরাণিক বা কাল্পনিক দেবতা অপেক্ষা তার সম্মুখে অবস্থিত নররূপী নারায়ণ বা মাতৃরূপী, পিতৃরূপী দেব-দেবীর আরাধনা বেশি স্বাচ্ছন্দ্য তথা আনন্দ উপভোগ করতেন। বলাবাহুল্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে তথা যুগের নিরিখে তিনি এটাই শ্রেয় বলে অনুভব করতেন।

অনেকের মতে বিদ্যাসাগর যেহেতু পরলোকে বিশ্বাস করতেন না তাই তিনি অধার্মিক বা নাস্তিক। কিন্তু এই মতটিও সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ মনে রাখতে হবে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত যুক্তিবাদী এবং বিজ্ঞানমনস্ক ছিলেন। বাস্তবের মাটিতে ভর করেই বিদ্যাসাগর তার সমগ্র জীবনের বিশাল কর্মকান্ডকে অতিবাহিত করেছেন। হিন্দু ধর্মে বলা হয় মানুষ ইহজন্মে যে কর্ম করে এবং সেই কর্মজনিত যে পাপ বা পুণ্য উৎপন্ন হয়, তাড়াশে ইহজন্মে ভোগ করতে পারে অথবা মৃত্যুর পরে স্বর্গলোকে বা নরকে ভোগ করে থাকে। সেই পাপ-পূণ্য ভোগের পরে মানুষকে আবার ইহ লোকেই ফিরে আসতে হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, - 'তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে পুনঃ মর্ত্যলোকং বিশন্তি'। সুতরাং পাপ ও পুণ্য ক্ষয়ের পর মানুষকে যেহেতু আবার ইহলোকে ফিরে আসতে হয় সেহেতু মানুষের মুক্তি লাভ হয় না। এই আত্মার চিরমুক্তি বা শান্তি লাভের জন্য মৃত্যুর পরে হিন্দু ধর্মে শ্রাদ্ধাদি নানাবিধ অনুষ্ঠান করা হয়। বিদ্যাসাগর কিন্তু তার পিতা ও মাতার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান করেছিলেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে বলা হয়েছে, "হিন্দুদের ন্যায় শ্রাদ্ধাদি ধর্ম কর্ম সমস্ত করিতেন, ..."[২৬] তবে বিদ্যাসাগর নিশ্চিত রূপে ইহলোকের কর্মকাণ্ডের উপরেই বেশি আস্থা রেখেছিলেন।

আর হয়তো এই কারণেই বিদ্যাসাগরের শিষ্য তথা অনুরাগী কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক বলে দাবি করে লিখেছেন – 'বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন, একথা তোমরা বোধ হয় জান না। যাহারা জানিতেন, তাহারাও কিন্তু সে বিষয়ে তাহার সঙ্গে কোন বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না। ...পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাব বন্যায় এদেশের এদেশের ছাত্রের ধর্ম বিশ্বাস টলিল, চিরকাল পোষিত হিন্দুর ভগবান সেই বন্যায় ভাসিয়া গেলেন, বিদ্যাসাগর নাস্তিক হইবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি?' তাই বিদ্যাসাগর যে পরলোক অপেক্ষা ইহলোকের উপর বেশি বিশ্বাসী ছিলেন সে কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বিনয় ঘোষ তার গ্রন্থে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের এহেন মন্তব্যকে উদ্ধৃতপূর্বক আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন –

> "বিদ্যাসাগর পরলোকে বিশ্বাস করতেন না বলে কৃষ্ণকমল কেন তাকে নাস্তিক বলেছেন জানিনা। পরলোকে বিশ্বাস না করলেই যে তাকে নাস্তিক হতে হবে, এমন কোন কথা নেই। বিদ্যাসাগর তবে ইহলোকেই বিশ্বাস করতেন, পরলোক মানতেন না তার জীবনে বহু ঘটনা ও কাহিনী থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।"[২৭]

একথা সত্যি যে, ধর্ম ও পরলোক বিষয়ে বিদ্যাসাগর প্রায়শই বিভিন্ন পরিহাস ও ঠাট্টার ছলে কথা বলতেন। বিদ্যাসাগরের জীবনের বহু ঘটনা থেকে আমরা এর উল্লেখ পাই। যেমন একবার শোনা যায় বিদ্যাসাগরের বাদুর বাগানের বাড়িতে এক অতিথিকে নিয়ে আসার জন্য ঐ এলাকার ব্রাহ্ম সমাজের এক প্রচারক শশীভূষণ বাবু অনেক ঘোরাঘুরি করে নাকি বাড়ি খুঁজে পাননি। পরে বিদ্যাসাগর অতিথির মুখ থেকে সেই কথা জানতে পেরে শশীভূষণকে ডেকে পাঠান এবং বলেন, - এত কাছে বাস করেও তুমি বুড়ো মানুষকে আমার বাড়িতে আনতে এত বেগ পেয়েছো, তবে তুমি মানুষকে কি করে পরলোকের পথ দেখাচ্ছ। এখান থেকে এখানেই তোমার যখন এগোলোযোগ তখন তুমি কি করে সেই অজানা পথে লোক চালান দাও। তুমি বাপু ও-ব্যবসা ত্বরায় ত্যাগ কর, ও তোমার কম্ম নয়। এখান থেকে এটা পরিষ্কার যে, বিদ্যাসাগর ধর্ম নিয়ে বা ইহলোক ও পরলোক নিয়ে কোন ভন্ডামিকে প্রশ্রয় দিতেন না। কিন্তু তার মানেই তিনি যে অধার্মিক ছিলেন বা নাস্তিক ছিলেন, একথা যেমন বিদ্যাসাগরের অত্যন্ত প্রসিদ্ধ সমসাময়িক জীবনীকার বিনয় ঘোষের মত একজন সুপন্ডিত মানুষের বোধগম্য হয়নি তেমন আমাদেরও বুঝতে একটু অসুবিধাই হচ্ছে।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মত কিছু জীবনীকারদের দাবি যে, বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে হিন্দু ধর্মের প্রতি উদাসীনতা এবং অনীহা প্রকাশ করেন। অনেকে আবার এই জন্য বিদ্যাসাগরকে নাস্তিক বা অধার্মিক অথবা খ্রিস্টান বলেও ব্যঙ্গ করতে ছাড়েননি। এখন হিন্দু ধর্ম বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞানহীন এই সকল মানুষের কথা শুনে যদি আমরা বিদ্যাসাগরকে বিচার করি তাহলে কিন্তু অবশ্যই আমাদের একটা মস্ত বড় ভুল হয়ে যাব। কারণ হিন্দু ধর্ম হল সমরসতার ধর্ম, হিন্দু ধর্ম উদারতার ধর্ম, হিন্দু ধর্ম মানবতার ধর্ম, হিন্দু ধর্ম সাম্য ও ভারসাম্য রক্ষার ধর্ম। সনাতন হিন্দু ধর্ম কখনোই সমাজের জাতপাত তথা গোড়ামিকে প্রশ্রয় দেয়নি। বিদ্যাসাগর হিন্দুধর্মের মূল সারাংশকে বুঝেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে বৈদিক মুনি ঋষিরা দিব্যজ্ঞজ্ঞানের দ্বারা এক বিশেষ ও দর্শন লাভের পর যে ধর্মমতকে উপলব্ধি করেছিলেন, তা কখনোই সমাজের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 352 - 363
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিশেষ কোন জাত-পাত বা সংকীর্ণ সংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকতে পারে না। বরং যারা এই ধর্মকে বুঝতে পারেননি তাদের অজ্ঞতার কারণেই পরবর্তীকালে এই ধর্মের মধ্যে এই সকল কুসংস্কার ব লোকাচার ধীরে ধীরে প্রবেশ করেছে। বিদ্যাসাগর আরো বুঝেছিলেন যে ধর্মের মর্ম বাণী – 'আত্মন মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়' অর্থাৎ জগতের কল্যাণেই নিজের মুক্তি, অথবা অয়ং নিজো পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্। উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্। অর্থাৎ এটা আমার এবং এটা অন্যের এই ধরনের চিন্তা হল সংকীর্ণ মানসিকতার, কিন্তু উদার ব্যক্তিদের কাছে এই জগত সংসারই হল আত্মীয় স্বরূপ, সেই ধর্মের মানুষেরা কখনোই সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারেন না। কিন্তু কালের কুপ্রভাবে কিছু কুসংস্কার তথা লোকাচারও এই ধর্মের মধ্যে প্রবেশ করে যায়। আর সেই কারণেই বিদ্যাসাগর সেই সকল তথাকথিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও লোকাচারে পুষ্ট হিন্দুদের প্রতি আক্ষেপ করে বলেছেন – "আমার তো বোধ হয়, ওরা যা বুঝতে গেছে, বুঝাতে পারে নাই।"[২৮] আর সেই কারণেই উনবিংশ শতকের কালের নিরিখে দাঁড়িয়ে বিদ্যাসাগর সমস্ত সংস্কার তথা লোকাচারের ঊর্ধ্বে উঠে ধর্মের কচকচানির মধ্যে না গিয়ে, প্রকৃত হিন্দু ধর্মের যে মূলভাব, মানব তথা জগতের কল্যাণ সেই দিকেই বেশি মনোনিবেশ করেছেন।

বিদ্যাসাগরের জীবনীকার বিহারীলাল এ কারণেই বিদ্যাসাগরকে কালের লোক বলেছেন, কিন্তু পাশ্চাত্য কুশিক্ষায় শিক্ষিত কালের লোক কখনোই বলতে চাননি। বিহারীলাল সরকার লিখেছেন, - 'অধ্যাপকের বংশ জন্মগ্রহণ লইয়া ব্রাহ্মণ পন্ডিতের সন্তান হইয়া, হৃদয়ে অসাধারন দয়া, পরদুঃখকাতর প্রবৃত্তি পোষণ করিয়া হিন্দু শাস্ত্রের প্রতি, হিন্দু ধর্মের প্রতি তিনি আন্তরিক দৃষ্টি রাখিতেন না কেন? ...বিদ্যাসাগর কালের লোক'। এখন এই মন্তব্য থেকে আমরা অনেকেই ভাবতে পারি বিদ্যাসাগর হিন্দু ধর্মের প্রতি অনাস্থাশীল ছিলেন। কিন্তু তা কখনোই নয়, বরং হিন্দু শাস্ত্রের মর্মবাণীকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কালের নিরিখে তিনি যা প্রয়োজন বলে উপলব্ধি করেছিলেন তাই করেছিলেন, যেমনটা করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, তার গুরু ভগবান শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদা দেবী, মহাত্মা গান্ধী তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা প্রাতঃ স্মরণীয় ডাক্তার কেশব বলীরাম হেড গেওয়ার প্রমূখরা। এদের জীবনের বহু ঘটনা থেকে আমরা উল্লেখ পাই যে সমগ্র জীবন ব্যাপী এরা শুধু লড়াই করেছেন হিন্দু ধর্মের কালপ্রভাবে প্রবিষ্ট জাত-পাত তথা উচ্চ-নীচের ভেদকে সমূলে বিনাশ করার জন্য। স্বামী বিবেকানন্দ নিজেও গাভীকে (গরুকে) মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু একবার যখন তার কাছে গোরক্ষা কমিটি থেকে কিছু লোক আসেন, তখন তিনি কড়া ভাষায় তাদেরকে জানান- 'এখন আশু কর্তব্য হল দেশমাতৃকার সেবা করা, ভারতবর্ষের যে হতশ্রী অবস্থা সেখান থেকে ভারতমাতাকে উদ্ধার করা, দীন-দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানো, তাদের সেবা করা। এখন গোমাতার সেবায় কোন কাজ নেই। এখন স্বামীজি যেহেতু কালের লোক তাই তৎকালীন যুগের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে তিনি এটাই শ্রেয় বলে বুঝেছিলেন। কিন্তু তিনি যদি প্রকৃত অর্থে গোমাতার প্রতি অশ্রদ্ধাশীল হতেন, তাহলে কখনোই সেই তৎকালীন যুগ থেকে এখন পর্যন্ত আর বিভিন্ন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে গোশালার সাড়ম্বর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যেত না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আজীবন কালীর সাধনা করে গেছেন। কিন্তু কালের নিরিখে তিনি বুঝেছিলেন ধর্মীয় হানাহানি তথা জাতপাতের ঊর্ধে সেই এক-অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করতে হলে প্রত্যেকটি মত ও পথের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনার মধ্যদিয়ে বোঝানোর প্রয়োজন আছে। আর সেই যুগের প্রয়োজনে তিনি মুসলিম ধর্মেরও সাধনা করেছেন। আর তার প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি বিশ্বের দরবারে ঘোষণা করেছিলেন, 'আমি হিন্দু বলে গর্ববোধ করি'। যিনি তার বিভিন্ন বক্তৃতায় মুসলমান ধর্মের বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার কথা বারংবার উল্লেখ করেছেন, তিনি আবার পরিব্রাজক কালে একজন মুসলমানর মেথরের কাছ থেকে তামাক চেয়ে খেয়েছিলেন। কাশ্মীরে এক মুসলমান কন্যাকে কুমারীরূপে পূজাও করেছিলেন। এখন এই সবই করতে হয়েছে কালধর্ম তথা যুগধর্মকে রক্ষা করার জন্য। এর মানেই যেমন শ্রীরামকৃষ্ণকে বা বিবেকানন্দকে অহিন্দু বা অধার্মিক বলা যায় না, তেমনি কালের নিরিখে তৎকালীন সমসাময়িক সামাজিক প্রেক্ষাপটের বিচারে বিদ্যাসাগরকেও অহিন্দু বা অধার্মিক বলা চলে না।

আমার মতে এই অর্থেই বিদ্যাসাগর ছিলেন – 'কালের লোক'। সুবল চন্দ্র মিত্র এক জায়গায় লেখেন - 'কাল ধর্মই তিনি পালন করিয়া গিয়েছেন। ইহাতে হিন্দুর অনিষ্ট হইয়াছে, হিন্দুধর্মে আঘাত লাগিয়াছে। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের বংশধর বিদ্যাসাগর উপনয়নের পর অভ্যাস করিয়াও ব্রাহ্মণের জীবন সর্বস্ব গায়ত্রী পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন'। অর্থাৎ এই কাল ধর্মকেই

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 352 - 363
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রক্ষা করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর অনেক সময় কুসংস্কারের সাথে সাথে হিন্দুদের কিছু নিত্য পালনীয় কিছু সুসংস্কারও ভুলে গিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নও স্বীকার করেছেন যে, বিদ্যাসাগর সন্ধ্যা বন্দনার মন্ত্রও ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিচার্য বিষয় এই যে, ভুলে যাওয়া থেকে কখনোই এটা প্রমাণিত হয় না যে, তিনি অহিন্দু বা অধার্মিক ছিলেন।

বিদ্যাসাগর জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ শানিয়েছিলেন। এখন এই কারণেও কেউ কেউ আবার বিদ্যাসাগরকে অধার্মিক বা নাস্তিক বলে থাকেন। আসলে তারা এমনটা বলে থাকেন, যেহেতু তারা জাতিভেদ প্রথাকে হিন্দুধর্মের অঙ্গস্বরূপ মনে করে থাকেন। কিন্তু এ-বিষয়ে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার যে, জাতিভেদ প্রথা কখনোই হিন্দু ধর্মের অঙ্গ নয়, বরং এটা হিন্দুধর্মের মধ্যে ঢুকে যাওয়া একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক। আর সেই কারণেই ভারতের প্রায় সমস্ত মহাপুরুষগণই এর বিরুদ্ধে আমৃত্যু সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন, যেমনটা করেছেন রাজা রামমোহন রায়, পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, যুগাবতার পরমহংস ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, ডাক্তার কেশব বলীরাম হেডগেওয়ার, মাধব রাও সদাশিব রাও প্রমুখরা। রামমোহন রায় জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম করেও, নিজে ব্যক্তিগত জীবনে জাতিভেদ প্রথাকে উপেক্ষা করতে পারেননি। তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' অর্থাৎ সকলই ব্রহ্মের অংশস্বরূপ, চিরকাল এই এক ও অদ্বিতীয় সত্তার উপাসনা করেও, নিজে ব্যক্তিগত জীবনে জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি। তাই তিনি যদিও বুঝেছিলেন'সর্বভুতান্তরাত্মা' অর্থাৎ সকলের মধ্যেই সেই এক পরমেশ্বর অবস্থান করছেন, তবুও তিনি ব্রাহ্মণের পক্ষে যাহা নিষিদ্ধ আহার গ্রহণ করতে পারেননি, অথবা অন্য জাতির মানুষের সাথে একত্রে আহারের নিষেধ সংস্কারও ত্যাগ করতে পারেননি।

অর্থাৎ ভারতের মহাপুরুষদের একাংশ জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তা পালন করতে পারেননি। বিদ্যাসাগর ছিলেন ঠিক তার বিপরীত। তিনি যেমন সারা জীবন জাতিভেদ প্রথার তীব্র বিরোধিতা করেছেন, তেমনি তা নিজের জীবনে পালন করেও দেখিয়েছেন। সেই সময় সংস্কৃত কলেজের নিয়ম ছিল ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ ছাড়া আর কেউ সেখানে পড়াশোনা করতে পারবে না। বিদ্যাসাগর নিজে সেই কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে এই প্রথাকে দূর করেছিলেন এবং জাত-পাত নির্বিশেষে সকলেরই সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়নের পথকে সুপ্রশস্থ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, বিদ্যাসাগর জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠে নিজেও একসাথে সমস্ত জাতি ও বর্ণের মানুষের সাথে একসাথে আহার করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত হতেন না। তাই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখা থেকে আমরা জানতে পারি, - 'একদিন সকালে উঠিয়াই শুনি মেয়েমহলে খুব সোরগোল উঠিয়াছে, ওমা, এমন তো কখনো শুনিনি, বামুনের ছেলে অমৃতলাল মিত্তিরের পাত থেকে রুই মাছের মুড়োটা কেড়ে খেয়েছে, কেউ বলল - ঘোর কলি? কেউ বলিল সব একাকার হয়ে যাবে, কেউ বলিল জাতজন্ম আর থাকবে না। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম - কে কেড়ে খেয়েছে? মা বললেন - জানিসনি? বিদ্যাসাগর।' আমরা অনুরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ পাই স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যকালের জীবনী থেকে। বিবেকানন্দের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত পেশায় ব্যারিস্টার ছিলেন। তার কাছে বিভিন্ন জাতের লোক আসত মক্কেল হিসাবে। বিশ্বনাথ দত্ত তাই তার বৈঠকখানায় ভিন্ন ভিন্ন জাতির জন্য নির্দিষ্ট অনেকগুলি হুকো রেখেছিলেন। একদিন বালক বিবেকানন্দের প্রশ্নে তার পিতা জানান, এতগুলি ভিন্ন ভিন্ন হুকুর রাখা হয়েছে যাতে এক জাতির হুকোতে টান মেরে অন্য জাতের মানুষের জাত না চলে যায়। এরপর একদিন নরেন্দ্রনাথ পিতার অগোছরে সমস্ত হুকাগুলিতে টান মেরে দেখার চেষ্টা করেন, যে কিভাবে জাত যায় এবং পরবর্তীকালে এই রকম স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের বহু ঘটনার উল্লেখ আমরা তার জীবনী থেকে জানতে পারি। বিবেকানন্দ তার জীবনের প্রায় শেষ সময় পর্যন্ত জাতপাতের বিরুদ্ধে এরকম নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যান এবং এই সংকীর্ণ জাতপাতের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করতে থাকেন। কিন্তু এই কারণে আমরা কখনোই বিবেকানন্দকে অহিন্দু বা অধার্মিক বলিনা, যেমনটি তিনি নিজেও কখনো বলেননি। বরং তিনি নিজেই দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন - আমি গর্বিত, কারণ আমি একজন হিন্দু। সুতরাং যে জাতপাতের বিরুদ্ধাচরণ করা সত্ত্বেও যদি বিবেকানন্দ একজন নৈষ্টিক হিন্দু হতে পারেন, তবে সেই একই কারণে কেন বিদ্যাসাগর হিন্দু নন?

Reference:
১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, শ্রীমা-কথিত, প্রথম খন্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা: পৃ. ৪৮
২. উপনিষদ্‌, ঈশোপনিষদ, শ্লোক- ৬, পৃ. ৭
৩. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, শ্রীমা-কথিত, প্রথম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পৃ. ৪৮
৪. তদেব, পৃ. ৪৮
৫. তদেব, পৃ. ৪৮
৬. ঈশ্বর ২০০, পৃ. ২০০
৭. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃ. ৪৮, ৪৯
৮. তদেব, পৃ. ৪৯
৯. তদেব, পৃ. ৪৯
১০. উপনিষদ্‌, কেনোপনিষদ্‌, দ্বিতীয় খন্ড, মন্ত্র ১, পৃ. ২৮
১১. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃ. ৪৯
১২. উপনিষদ্‌, কেনোপনিষদ্‌, প্রথম খণ্ড, শ্লোক ৩, পৃ. ২৪
১৩. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃ. ৪৯
১৪. তদেব, পৃ. ৪৮
১৫. তদেব, পৃ. ৫৩
১৬. তদেব, পৃ. ৫৩
১৭. তদেব, পৃ. ৫৬
১৮. তদেব, পৃ. ৫৬
১৯. যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর, বিনয় ঘোষ, পৃ. ১১৫ ১১৬
২০. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, ১৯০৯, ইন্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ, পৃ. ৫২০
২১. বন্দ্যোপাধ্যায়, অ. ১৯৬৪, ঈশ্বর রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), মডার্ণ বুক হাউস, কলকাতা, পৃ. ৩৪০
২২. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃ. ৪৮
২৩. তদেব, পৃ. ৪৮
২৪. উপনিষদ্‌, তৈত্তিরীয়োপনিষদ্‌, পৃ. ৩১৬
২৫. যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর, পৃ. ১১৫
২৬. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃ. ৪৮
২৭. বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, পৃ. ৩১০
২৮. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃ. ৪৮

Bibliography:
ইসলাম, নুরুল, *ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসের রূপরেখা,* কলকাতা: শ্রীধর প্রকাশনী, ২০১৮
ঘোষ, বিনয়, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ (প্রথম খন্ড),* কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ (প্রথম সংস্করণ)
ঘোষ, বিনয়, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ (দ্বিতীয় খন্ড),* কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট্‌ লিমিটেড্‌, ১৯৬৪ বঙ্গাব্দ (প্রথম সংস্করণ)
ঘোষ, বিনয়, *যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর,* কলকাতা: পাঠভবন, ১৯৬০ (প্রথম সংস্করণ)
চট্টোপাধ্যায়, শরৎ, *বিদ্যাসাগর (সংগঠন ও শিক্ষা প্রসঙ্গ),* কলকাতা: নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, ২০০৭ *প্রার্থনা ও সংগীত,*

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 41
Website: https://tirj.org.in, Page No. 352 - 363
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বেলুড় মঠ: রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, ১৪১২ (চতুর্থ সংস্করণ)
মজুমদার, রমেশচন্দ্র, *বিদ্যাসাগরের বাংলা গদ্যের সূচনা ও নারী প্রগতি*, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিকেশন লিমিটেড, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ
মুখার্জি, সুমন, *ঈশ্বর ২০০ (নব রূপে ঐতিহাসিক মূল্যায়ন)*, কলকাতা: মডার্ণ বুক্ হাউস, ২০২০ (প্রথম প্রকাশ)
রায়, অর্ণব, *বিদ্যাসাগর (আধুনিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, বিজ্ঞানমনস্কতা)*, কলকাতা: ছাড়পত্র প্রকাশন, ২০১৯ (প্রথম সংস্করণ)
বন্দোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ, *বিদ্যাসাগর*, কলকাতা: স্ট্যান্ডার্ড পাবলিকেশন, ১৯৯০
বসু, অনিলচন্দ্র, *প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য পরিক্রমা*, কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১০
বন্দ্যোপাধ্যায়. অ, *ঈশ্বর রচনাবলী*, কলকাতা: মডার্ণ বুক্ হাউস, ১৯৬৪
বেদান্তচঞ্চু, শ্রীপূর্ণচন্দ্র, *সাংখ্যকারিকা*, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৭ (দ্বিতীয় মুদ্রণ)
সামন্ত, অমিও কুমার, *বিদ্যাসাগর*, কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৪